রোযাদারের জন্য স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করার বিধান ।

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমু দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। কিন্তু আপন (জৈবিক) চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী ।

অপর বর্ণনায় আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল সা. রমজান মাসে রোযা অবস্থায় (স্ত্রীদের) চুম্বন করতেন ।

অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা (রা.) বলেন, তোমাদের মাঝে কে নিজের চাহিদা পূরনের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে যেমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখতেন রাসূলুল্লাহ সা. ।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সা. আমাকে এমন অবস্থায় চুমু দিতেন যখন আমরা উভয়ে রোজাদার ।

ইবনে হিব্বানের[১] বর্ণনায় এসেছে, আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেছেন, রাসূল সা. নিজ স্ত্রীদের রোযা অবস্থায় চুমু দিতেন। আমি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম ফরজ এবং নফল সব ধরনের রোযা অবস্থায়? তিনি বললেন, ফরজ-নফল সব ধরনের রোযা অবস্থায় ।[২]

হাফসা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল তাকে রোযা অবস্থায় চুমু দিতেন ।[৩]

ওমর বিন আবু সালমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেন রোজাদারের জন্য চুমু দেয়া বৈধ কিনা? রাসূল সা. বলেন, তুমি এ বিষয় উম্মে সালমা রা. কে জিজ্ঞাসা কর। উম্মে সালমা তাকে জানান, রাসূল সা. তা (স্ত্রী-চুম্বন) করতেন। ওমর বিন আবু সালমা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (আপনার কথা ভিন্ন) । রাসূল সা. তাকে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশি পরহেজগার ।[৪]

ওমর ইবনে খাত্তাব রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রোজা অবস্থায় চিত্ত বিনোদন করতে গিয়ে স্ত্রীকে চুমো দিলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আজ এক জঘন্য অপরাধ করে ফেলেছি– রোযা থেকে আমি স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। নবী সা. বললেন, বলত দেখি যখন তুমি পানি দ্বারা কুলি কর তার বিধান কি? উত্তর দিলাম, এতে কোন অসুবিধা নাই। তিনি বললেন, তবে তুমি কী এমন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে? অর্থাৎ এটা কোন অপরাধই নয় ।

হাদিসগুলো থেকে যা শিখলাম :

১. রোজাদারের জন্য চাই সে যুবক হোক বা বৃদ্ধ স্ত্রীকে চুমো দেয়া এবং আলিঙ্গন করা জায়েজ যদি যৌন তাড়নার বশবর্তী হয়ে সহবাসে লিপ্ত বা বীর্যপাত হবে না বলে নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা থাকে। চাই তার রোজা নফল হোক বা ফরজ, রমজানে হোক বা অন্য কোন মাসে ।

২. হাদীসে আলিঙ্গন দ্বারা উদ্দেশ্য গায়ে গা মিলানো। যেমন- স্পর্শ করা বা জড়িয়ে ধরা। আলিঙ্গন এখানে স্ত্রী সহবাস উদ্দেশ্য নয়। কারণ স্ত্রী সহবাস অবশ্যই রোযাভঙ্গকারী ।

৩. রমজান মাসে কোন রোজাদার যদি আপন স্ত্রীকে চুমু দেয় অথবা স্পর্শ করে কিংবা আলিঙ্গন করে আর এতে তার বীর্যস্খলন হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এরপরও তাকে সারাদিন রোজাবস্থায় থাকতে হবে। এবং রোজা কাজা করতে হবে তাওবা-ইস্তেগফারসহ। কারণ আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন, একজন রোজাদার তার চাহিদা এবং খানা-পিনা আমার কারণেই ছাড়ে। অপর এক বর্ণনায় রাসূল

---

[১]-৩৫৪৫

[2] বুখারি :১৮২৬ মুসলিম ১১০৬ আবু দাউদ: ২৩৮৪ আহমাদ: ৬/৪৪

[3] মুসলিম :

[4] মুসলিম:১১০৮

সা: বলেন, সে তার স্বাদ গ্রহণ আমার জন্যই ত্যাগ করে এবং তার স্ত্রী আমার জন্যই ছাড়ে। তবে যদি 'মজি' বের হয় তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুসারে এতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না তবে তার জন্য উচিত হলো যৌন উত্তেজক আচরণ যেগুলো হারামে পতিত করার সম্ভাবনা রাখে তা হতে বিরত থাকা।[১]

৪. হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় চুমু দেয়া বৈধ হওয়া রাসূল সা:-এর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নয় বরং সমগ্র উম্মতের জন্য এটি বৈধ। যদি এমতাবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ তথা সহবাস বা বীর্জপাত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।[২]

৫. রাসূল সা: সবচে' বেশি আল্লাহকে ভয় করতেন। কারণ আল্লাহকে তিনিই সবচে' জানতেন। সবচে' ভালো করে চিনতেন।

৬. হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, অতিভক্তি ও অতিরঞ্জন পরিহার করা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে উল্লেখিত হাদিসে 'রোজাবস্থায় রাসূলের সা: জন্য স্ত্রীদের চুমু দেয়া বৈধ হলেও উম্মতের জন্য তা অবৈধ- এ ধরনের আকীদা পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ রাসূল সা: কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বলেন, সাবধান! আমি তোমাদের সবারচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী। অন্য হাদিসে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর বিধান সম্মর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখি।

৭. হালাল-হারাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে সাহাবীদের আগ্রহ, আল্লাহকে তারা কী পরিমাণে ভয় করতেন এবং ইবাদত-বন্দেগী নষ্ট হওয়া বা ত্রুটিপুর্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তারা যে কত সর্তকতা অবলম্বন করতেন হাদীসটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৮. এ হাদিসে যে সকল সূফী এ আকীদা পোষণ করে যে, যারা ঈমান ও আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তারা শরীয়তের বিধান পালন করার বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত, তাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হলো। কারণ রাসুল সা: যিনি ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সকল মানুষের চেয়ে কামেল তিনি নিজেই শরীয়তের বিধান সর্বাধিক বেশি গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। এছাড়া হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণ হয়- যারা মনে করে যাদের ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে তাদের জন্য কোন কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া শিথিলতার সাথে দেখা হবে এবং এতে তাদের কোন গুনাহ হবে না তা ভুল।

৯. ওমর বিন খাত্তাবের হাদীসে কিয়াস ও একই বিধানে দুটি বিষয় একত্র করা সাব্যস্ত হয়। যদি উভয়ে পরস্পর একই সাদৃশ্যের বা একই কারণের হয়ে থাকে। কারণ যেমনিভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া কারণ হয়ে থাকে পানি গলায় বা পেটে প্রবেশ করার তা সত্তেও তাতে রোযাভঙ্গ হয় না অনুরূপভাবে স্ত্রীদের চুমু দেয়া সহবাসের কারণ হয়ে থাকে যদ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়। কিন্তু যেহেতু উল্লেখিত প্রথমটি দ্বারা যেহেতু রোযাভঙ্গ হয় না তাহলে অপরটির বিধানও একই হবে।

---

[1] ফতোয়া বিন বায কিতাবুতদাওয়া : ১৬৪ /২ মাজমু ফতোয়া: ২৬৮-৩১৫/১৫

[2] শরহু ইবনে বাত্তাল ৫৬/৪ মিনহাতুল বারী:৩৬৪/৪

সফর অবস্থায় রোযা রাখা না রাখা

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

«أنَّ حَمزَةَ بنَ عَمْرٍو الأسلميَّ τ قالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : أأصُومُ في السَّفَرِ؟ وكَانَ كَثيرَ الصِّيامِ، فقَالَ: إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» رواه الشيخان

হামজাহ ইবনে আমর আসলামী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন, সফর অবস্থায় আমি কি রোযা রাখব? উল্লেখ্য তার অধিক রোযা রাখার অভ্যাস ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার ইচ্ছা, রাখতে পার, নাও রাখতে পার।[1]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে রা. বর্ণিত,

«سَافَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُم دَعَا بإناءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَاراً لِيرَاهُ النَّاسُ، فَأفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وكَانَ ابنُ عَباسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ الله في السَّفَرِ وَأَفْطَر، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ومَنْ شَاءَ أَفْطَر»

রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় সফর করে আসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন। অতঃপর পান পাত্র চাইলেন দিনের বেলায় মানুষকে দেখায়ে পান করলেন। রোযা না রাখা অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। ইবনে আব্বাস রা. বলতেন: সফর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন এবং ভেঙ্গেছেন, দুটিই করেছেন। অতএব যার ইচ্ছে হবে রোজা রাখবে, যার ইচ্ছে হবে না রোজা রাখবে না।[2]

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন:

«كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَم يَعِبِ الصَّائِمُ على المُفْطِرِ ولا المُفْطِرُ عَلى الصَّائِمِ» متفق عليه

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করছিলাম, রোযাদার এবং ভোজদার কেউ কাউকে কিছু বলেনি।[3]

আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন:

«كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ ومِنَّا المُفطِرُ، فلا يَجِدُ الصَّائمُ على المُفطِرِ، ولا المُفطِرُ على الصَّائِمِ، يَرونَ أنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فصَامَ فَإنَّ ذَلكَ حَسَنٌ، ويرَونَ أنَّ من وَجَدَ ضَعْفَاً فَأَفْطَرَ فَإنَّ ذَلكَ حَسَن» رواه مسلم

আমরা রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করছিলাম আমাদের মধ্যে কেউ রোযা রেখে ছিল কেই রোযা রাখেনি। রোযাদার বেরোযাদার কেউ কাউকে কিছু বলেনি। তারা মনে করছিল যার শক্তি আছে সে রোযা রাখবে, বরং তার জন্য এটাই ভাল, আর যে দুর্বলতা অনুভব করবে সে রোযা ভঙ্গ করবে, বরং তার জন্য এটাই ভাল।[4]

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন :

«سافَرْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى مكَّة ونَحْنُ صِيامٌ، فنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ الله :

إنَّكم قدْ دَنَوتُم من عَدُوِّكم والفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ، فكانَتْ رُخصَةً، فمِنَّا مَنْ صَامَ، ومنَّا مَنْ أفطَر، ثُم نَزَلْنَا

---

[1] বুখারী ১৮৪১ মুসলিম ১১২১ ।

[2] বুখারী৪০২৯ মুসলিম ১১১২।

[3] বুখারী ১৮৪৫ মুসলিম ১১১৮ ।

[4] মুসলিম ১১১৬ তিরমিজী ৭১৩ আহমাদ ১২/৩

مَنْزِلاً آخَرَ فقَالَ: إِنَّكُم مُصَبِّحُو عدُوِّكُم والفِطرُ أقْوَى لكم فأفْطِرُوا، وكَانَت عَزْمَةً فَأفْطرنَا، ثم قَالَ: لقَد رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلكَ في السَّفَرِ» رواه مسلم.

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রোযা অবস্থায় মক্কায় গমণ করলাম, আমরা এক স্থানে অবতরন করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা তোমাদের শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছ এখন রোজা না রাখা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে। রাসূলের এ কথা অনুমতি ছিল, আমাদের ভিতর কেউ রোযা রাখল কেউ ভেঙ্গে ফেলল। অতঃপর আর এক স্থানে আমরা অবতরন করলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা তোমাদের শত্রুদের সামনা সামনি হচ্ছো রোযা ভেঙ্গে ফেলা তোমাদের শক্তির কারণ হবে তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল আর এ নির্দেশ ছিল কঠোর, আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। আবু সাঈদ রা. বলেন, এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে আমরা রোযা রাখতাম।[১]

হাদীসে থেকে যা শিখলাম :

১. ইসলামের মহানুভবতা এবং ইসলামী শরীয়াতের ছাড় ও বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্য আলাদা সুযোগ।

২. রোযা রাখা না-রাখা মুসাফির ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। যা সহজ তাই তার জন্য সুন্নত।

৩. সফর অবস্থায় রোযা রাখতে কষ্ট হলে ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম। আর সফর অবস্থায় রোযাতে সমস্যা না হলে, রোযা রাখাই উত্তম।

৪. বিভিন্ন কাজের দরুন, যিনি সর্বদা সফরে থাকেন বা অধিক হারে সফর করেন, যেমন যানবাহনে যারা চাকরী করেন, তারা সফর অবস্থায় ফরজ রোযা রাখবেন, যদি রোযা তাদের জন্য কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর না হয়, নতুবা তারা দায়মুক্ত হবে কিভাবে? বরং তাদের কাজা করার সুযোগ না থাকলে সফর অবস্থায় রোযা রাখা ফরজ। সে ব্যক্তির সফর করাই যার পেশা।

৫. দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত শরীয়তের দায়িত্ব যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করা।

৬. সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না-রাখার ক্ষেত্রের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত অনুসরণ করাই উত্তম।

৭. হামজাহ আসলামী রা. এর হাদীস দ্বারা এ কথারও প্রমাণ মিলে যে, হালাল হারাম বিষয়ে যে ব্যক্তি জানে তার কাছে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া। এটাই সাহাবাদের অভ্যাস ছিল।

৮. মুসলিম শাসক কোন বৈধ কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করা ফরজ। হ্যা, গোনাহের নিদের্শ হলে তার আনুগত্য করা যাবে না।

৯. ইমামের দায়িত্ব হল অধীনদের প্রতি নম্রতা দেখানো এবং তাদের দুর্বলদের প্রতি লক্ষ রাখা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে রোজা না রাখার কথা বলেছেন, যাতে শত্রুর মোকাবেলায় সকলে শক্তি পায়, যদিও তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল রোজার কারণে যাদের ক্ষতি হত না।

১০. যে সব বিধি-বিধানে দু'ধরেনর সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেখানে একটিতে অবদারিত করে দেয়ার অধিকার কারো নেই। তদ্রুপ মত বিরোধপূর্ণ মাসআলার বিষয়টিও। যার নিকট যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় সে তা করতে বাধ্য নয়।

১১. শরীয়তের রুখসত বা কোন আয়াত বা হাদিসের দুর্বোধ্য বিষয়ে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে না।

---

[1] মুসণিম ১১২০ আবু দাউদ ২৪০৬ আহমাদ ২৮৪/৩

১২. এ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহবাদের পরস্পরের মাঝে ভাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল, আরো ছিল তাদের দ্বীনের ব্যাপ্যারে গভীর জ্ঞান। যেমন রোজাদার ভোজদার কেউ কাউকে দোষারূপ করেনি। যেহেতু সকলেই শরীতের উপর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেছে।

১৩. রমজান মাসে সফর করা বৈধতার প্রমাণ মিলে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহু ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রমজান মাসেই সফর করেছিলেন।[১]

১৪. যে ব্যক্তি আগামীকাল সফর করবে তার জন্য রোজা না রাখার নিয়তে রাত্রিযাপন সঠিক নয়, কেননা নিয়তের দ্বারা মুসাফের হবে না যতক্ষণ না সে সফরে বের হবে।

১৫. সফরের নিয়ত করে ঘরে অবস্থানরত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। তখনই রোযা তার ইচ্ছাধীন হবে যখন সে সফরের জন্য বের হবে বা বাহনে আরোহন করবে।[২]

---

[1] আত্ তামহীদ ৪৮/ ২২

[2] আত্ তামহীদ ৪৯/ ২২।

†ivRv`vi‡K BdZvi Kiv‡bvi dWRjZ

জায়েদ বিন খালেদ জুহানি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি কাউকে ইফতার করাবে সে ওই ব্যক্তির সমান ছওয়াব পাবে। অথচ রোজাদার ব্যক্তির নেকি থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।'[১]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে- তাকে খাওয়াবে এবং পান করাবে সে তার সমান নেকি লাভ করবে অথচ তার নেকি থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।[২]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে এক মহিলা ইফতার করানোর জন্য ডাকলে তিনি সে ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন, তোমাকে আমি জানাচ্ছি যে, যে ব্যক্তি কোনো গৃহবাসীর কাছে ইফতার করবে, গৃহবাসী সে ব্যক্তির অনুরূপ নেকি পাবে। মহিলা বললেন, আমি চাই আপনি আমার কাছে ইফতার করার জন্য কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করবেন– বা এ জাতীয় কিছু বলেছেন। আবু হুরায়রা রা. উত্তর দিলেন, আমি চাই এ নেকি আমার পরিবারই হাসিল করুক।[৩]

হাদিস থেকে যা শিখলাম :

১. আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি দান-খয়রাতের নানা ক্ষেত্র উম্মুক্ত করেছেন। নেকি অর্জনের বিবিধ দ্বার খুলে দিয়েছেন। এরই অন্যতম হল, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য প্রতিদানের ঘোষণা দেয়া।[৪]

২. রোজাদারকে ইফতার করানো একটি ফজিলতপূর্ণ আমল। যেমনটি জানা গেল- যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করাবে সে তার অনুরূপ নেকি লাভে ধন্য হবে।

৩. রোজাদারকে ইফতার করালে তার বদলা মহান আল্লাহ রোজাদারের আমলনামা থেকে নয়; নিজের পক্ষ থেকে দিবেন। অতএব রোজাদারের নেকি সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। আর এভাবে নেকি নির্ধারণ করাও রোজার ফজিলতের প্রমাণ বহন করে।[৫]

৪. এ থেকে এও প্রতীয়মান যে, ইফতারের দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। বরং বুযুর্গি দেখিয়ে বা নেকি কমে যাওয়ার আশংকায় ইফতারের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা এক ধরনের বাড়াবাড়ি। কারণ অন্যের কাছে ইফতার করলে নিজের পুণ্য হ্রাস পায় না। তবে ইফতারের দাওয়াত যদি শুধু মিসকিনদের জন্য হয় আর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় কোনো ধনী লোক তাহলে ভিন্ন কথা। (এ ক্ষেত্রে তার নেকি হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।)

৫. আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সদাচারের অংশ হিসেবে এবং তাদের মনোতুষ্টির খাতিরে দাওয়াতে সাড়া দেয়া, তাদের কাছে গিয়ে ইফতার করা যাতে তারা পুণ্য হাসিল করতে পারে উচিৎ কাজ। আবু হুরায়রা রা. এর উক্তি থেকে তাই বুঝা যায়।

৬. রোজাদারকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্য হওয়া চাই- ইফতার করানোর নেকি কামাইয়ের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হওয়া। খাদ্য-পানীয় সরবরাহের মাধ্যমে আপন ভাইকে সম্মানিত করা। গরিবদের ইফতার করানোর সময় এ চেতনা জাগ্রত রাখা সবিশেষ কর্তব্য।

৭. রোজাদারকে বাসায় নিয়ে আপ্যায়ন করা, তার জন্য খাবার প্রস্তুত করা বা কিনে দেয়া কিংবা প্রস্তুত করে তার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়া বা ইফতার কিনে দেয়া- এসবই দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে যে অপচয়ের প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা উচিৎ।

৮. গরিবকে যদি ইফতার কিনে খাওয়ার জন্য টাকা দেয়া হয় আর সে এর কিছু দিয়ে ইফতার কিনে বাকিটা রেখে দেয় তার অন্য কোনো প্রয়োজন মেটাবার জন্য তবুও এর দ্বারা হাদিসে বর্ণিত ইফতার করানোর সওয়াবের অধিকারী হবে। অথচ বেচারার প্রয়োজনও পূর্ণ হলো।

---

[১]. তিরমিযি : ৮০৭, ইবনে মাজাহ : ১৭৪৬, নাসাযি : ৩৩৩০-৩৩৩১, ইবনে কুযাইমা : ২০৬৪, ইবনে হিব্বান : ৩৪২৯

[২]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৯৭০৫ তাবরানি ৫/২৫৬

[৩]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৭৯০৮

[৪].আরেজাতুল আহওয়াজি : ৪/২১

[৫]. ফয়জুল কাদির : ৬/১৮৭

রমজানে শেষ দশকের রাত্রি জাগরণ

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (রমজানের) শেষ দশক উপস্থিত হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন। এর রাত্রি জাগরন করতেন এবং পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন।[১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এমন কষ্ট-মুজাহাদা করতেন যেমন করতেন না অন্য সময়।[২]

আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে নিজ পরিবারকে জাগ্রত করতেন।[৩]

হাদিসটি অন্য শব্দে ইমাম আহমদ র. এভাবে বর্ণনা করেন– রমজানের শেষ দশক শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারস্থ লোকদের জাগাতেন এবং উঁচু করে লুঙ্গি পড়তেন। আবু বকর বিন আইয়াশকে জিজ্ঞেস করা হল, লুঙ্গি উঁচু করে পড়ার অর্থ কী? বললেন, স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ।[৪]

হাদিস থেকে যা শিখলাম :

১. পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদতে অধিক কষ্ট স্বীকার করতেন। অন্য সকল রাত্রি থেকে রমজানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে তাঁর পরিশ্রম বেড়ে যেত।

২. রমজানের শেষ দশকে স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করে সালাত, জিকির প্রভৃতি ইবাদতের মধ্যে আত্মনিয়োগ করত বিনিদ্র রাত কাটানো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম আদর্শ।

৩. রমজানের শেষ দশকে পরিবারের সদস্যদের রাতে ঘুম থেকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দেয়া সুন্নত। যদি অভ্যাসবশত তারা রাতে জেগেই থাকে তাহলে যেন গল্প-গুজবে না মেতে সালাত ও জিকির-আযকারেই লিপ্ত থাকে।

৪. গৃহকর্তার জন্য স্ত্রী-সন্তানকে নফল কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং এর প্রতি জোর দেয়া জায়েজ আছে। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য এ নির্দেশ মান্য করা ওয়াজিব।[৫]

৫. রমজানের শেষ দশ রাতে যথাসম্ভব সালাত-জিকিরে ডুবে থাকা মুস্তাহাব। কারণ তা নবীজীর আমল। যেমনটি আমরা জানতে পারলাম উপরের হাদিস থেকে। আর সারারাত ইবাদতে কাটানো অপছন্দনীয় মর্মে যেসব হাদিস এসেছে সেসব দ্বারা উদ্দেশ্য বছরভর রাত্রি জাগরণ করা। তবে যেসব রাতে জাগার জন্য বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো রাত জাগা এসব হাদিসের হুকুমের ব্যতিক্রম।[৬]

৬. শেষ দশকের রাতগুলোর জাগার উদ্দেশ্য লাইতুল কদরের সন্ধান করা। আর আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ যে তিনি লাইতুল কদরকে রমজানের শেষ দশকে লুকিয়ে রেখেছেন। যদি সারা বছরের যে কোনো রাতে তা সুপ্ত রাখা হত তাহলে এর সন্ধান পাওয়া অনেক দুষ্কর হত এবং অধিকাংশের ভাগ্যেই লাইলাতুল কদর জুটত না।[৭]

সমাপ্ত

---

[১]. বুখারি : ১৯২০, মুসলিম : ১১৭৪

[২]. মুসলিম : ১১৭৫

[৩]. তিরমিযি : ৭৯৫

[৪]. আহমদ : ১/১৩২

[৫]. শরহু ইবনে বাত্তাল : ৪/১৫৯, আল মুফহিম : ৩/২৪৯

[৬]. শরহুন নাবাবি আলা মুসলিম : ৮/৭১, আল ফাতাওয়া আল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়া : ২/৪৯৮

[৭]. শরহু ইবনে বাত্তাল : ৪/১৫৯

gmwR‡` gwnjv‡`i BwZKvd cm‡½

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করার কথা বললে তিনি তাঁর কাছে (ইতিকাফ করার) অনুমতি চান। হুজুর অনুমতি প্রদান করেন। হাফসা রা. আয়েশার কাছে হুজুরের অনুমতি এনে দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি তার জন্যও অনুমতি এনে দেন। এ দেখে যয়নব বিনতে জাহাশ রা. (পর্দা টানিয়ে) ঘর বানানোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালন করে ঘর বানানো হয়। আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত সম্পন্ন করে নিজ ঘরে প্রবেশকালে এসব ঘর দেখতে পান। জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী? সাহাবিরা জানান, আয়েশা, হাফসা ও যয়নবের ঘর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠেন- 'এর মধ্যেই কি তোমরা নেকি দেখলে? আমি ইতিকাফই করব না।' একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফ ছেড়ে চলে গেলেন। অতপর রমজান বিদায় নিয়ে শাবান এলে তিনি দশ দিন ইতিকাফ করেন।[১]

মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন। ফজর নামাজ পড়তেন তারপর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একদা তিনি মসজিদে পর্দা টানাতে আদেশ করলেন। তেমনি করা হলো। তিনি ইচ্ছে করলেন রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করার। যয়নাব রা.-ও পর্দা টানিয়ে দিতে বললেন, পর্দা টানানো হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্য বিবিগণও পর্দা টানানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর নামাজ সমাপান্তে যখন পেছন ফেরেন তো এসব পর্দা দেখতে পান। বলে উঠেন, এতেই কি তোমরা পুণ্য দেখলে? এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পর্দা খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং ইতিকাফ ছেড়ে দেন।[২] তারপর শাওয়ালের প্রথম দশকে তা পূর্ণ করেন।

হাদিস থেকে যা শিখলাম :

১. মহিলাদের জন্য মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি রয়েছে যদি ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়।[৩]

২. মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইতিকাফ করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত।[৪] অনুমতি ছাড়া যদি ইতিকাফ করে তাহলে স্বামীর জন্য তাকে ইতিকাফ থেকে বের করে আনার অনুমতি রয়েছে। স্বামী ইতিকাফের অনুমতি দেয়ার পর যদি দেখে কোনো কারণে স্ত্রীকে বের করে আনা উচিৎ তাহলে সে তা করতে পারে।[৫]

---

[১]. বুখারি : ১৯৪০

[২]. মুসলিম : ১১৭২

[৩].শরহুন নাবাবি : ৮/৭০, আল মুফহিম : ৩/২৪৮

[৪]. ইবনে মুলকিন র. এ ব্যাপারে সকলেন ইজমা নকল করেছেন তদীয় কিতাব 'শরহুল উমদা'তে : ৫/৪২৯

[৫]. শরহুন নাবাবি : ৮/৭০, মুফহিম : ৩/২৫৪, ফতহুল বারি : ৪/২৭৭

৩. শুরু করার পর বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ইতিকাফ ছেড়ে দেয়া জায়িজ আছে।

৪. স্বামীর জন্য নিজ স্ত্রী ও পরিবারকে আদব শিক্ষা দেয়া, তাদের কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দেয়া জায়িজ আছে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের ইতিকাফের অনুমতি দেয়ার পর পরস্পর অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকায় তা প্রত্যাহার করে নেন।[৬]

৫. নফল ইবাদত শুরু করার পর তা সম্পন্ন করতে না পারলে তার কাজা করার নিয়ম রয়েছে।[৭]

৬. অতিরিক্ত আভিজাত্য দেখানো কুপরিনতি বয়ে আনে কারণ তা হিংসা থেকে সৃষ্ট। আর হিংসা করা মহাপাপ।

৭. ভালো কাজও ছেড়ে দেয়া জায়িজ আছে যদি তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে।[৮]

৮. ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে নির্জনে ইবাদত-বন্দেগির সুবিধার্থে একটি জায়গা নিজের জন্য বরাদ্দ করে নেয়া জায়িজ আছে যদি এতে মুসল্লিদের সমস্যা না হয়। আর জায়গাটি নির্ধারণ করা চাই মসজিদের খালি অংশে বা শেষ প্রান্তে যাতে মুসল্লিরাও সমস্যা বোধ না করে আবার ইতিকাফকারীর নির্জনতাও পূর্ণতা পায়।[৯]

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সুন্দর আখলাক এবং স্ত্রীদের সঙ্গে তার চমৎকার হৃদ্যতা। কারণ তিনি যখন তাদেরকে ইতিকাফ করতে বারণ করেন শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তাদের 'রিয়া'র আশংকায়, নিজেও তাদের সঙ্গে ইতিকাফ ছেড়ে দেন। অথচ তিনি তাদেরকে বারণ করে নিজে ইতিকাফ করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা দেখিয়ে এবং তাদের মন খুশি করার জন্য। এভাবেই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য স্ত্রীকে শাসন করার সময় লক্ষ্য রাখা যে শাসন যেন প্রতিশোধের পর্যায়ে চলে না যায় এবং দাম্পত্য ভালোবাসায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

১০. ইতিকাফরত মহিলার যদি মাসিক আরম্ভ হয় তাহলে তিনি ইতিফাক ছেড়ে চলে যাবেন এবং পবিত্র হওয়ার পর বাকিটুকু পুরো করবেন।[১০]

১১. যদি কোনো ব্যক্তি নফল ইবাদতের নিয়ত করে কিন্তু তা এখনো শুরু করেনি তাহলে তার জন্য সুযোগ আছে ইবাদতটি একেবারে ছেড়ে দেয়ার এবং ইচ্ছা করলে পরবর্তী করার।[১১]

১২. যে ব্যক্তি কোনো ইবাদতে রিয়ার উপস্থিতি টের পাবে তার জন্য সে ইবাদত পরিহার করা জায়িজ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আমলই তার প্রমাণ। কেননা

---

[৬]. শরহুন নাবাবি : ৮/৬৯ মুফহিম : ৩/২৪৫

[৭]. প্রাগুক্ত

[৮]. শরহু ইবনে বাত্তাল : ৪/১২৮, ফতহুল বারি : ৪/২৭৭

[৯]. শরহুন নাবাবি : ৮/৬৯

[১০]. ইবনে বাত্তাল : ৪/১৭৪, মুগনি : ৪/৪৮৭

[১১]. শরহু ইবনে বাত্তাল : ৪/১৮৩

তিনি স্ত্রীদের মাঝে রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ধরন দেখে তাতে রিয়ার সম্ভাবনায় ইতিকাফ ভঙ্গ করান। আর নিজের ইতিকাফটিকেও পিছিয়ে দেন।[১২]

১৩. ইতিকাফকালে যথাসম্ভব স্ত্রী-পরিজন এবং মানব সঙ্গ থেকে দূরে থাকা মুস্তাহাব। তবে জামাতে সালাত আদায়, খাওয়া বা অন্য কোনো প্রয়োজনে এতে দোষ নেই।[১৩]

১৪. ইতিফাক করা সুন্নত রমজান মাসে। তবে অন্য মাসেও ইতিকাফ করা যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাওয়ালেও ইতিকাফ করেছেন। (রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ কিফায়াহ আর অন্য মাসে নফল ও কাজা ইতিকাফ করা যায়।)

১৫. মসজিদের ঘরে– যার গেট মসজিদের ভেতরে ইতিকাফ করা যাবে। গেট যদি মসজিদের বাইরে হয় তাহলে সে ঘরে ইতিকাফ করা যাবে না।[১৪]

---

[১২]. প্রাগুক্ত

[১৩]. শরহু ইবনে মুলকিন : ৫/৪৩৫

[১৪]. ফাতাওয়ায়ে লাজনা : ৬৭১৮

BwZKvdKvixi mv‡_ mv¶vZ:

সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়ায়ী বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফে থাকাকালিন আমি রাত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসি। কথা–বার্তা শেষে ফেরার সময় রাসূল সা. দাড়ালেন আমাকে এগিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। – সাফিয়্যাহ রা. এর অবস্থান ছিল একটু দূরে, দারে উসামা বিন যায়েদ এ–পথে মধ্যে দুইজন আনসারী লোক অতিক্রম করল, তারা নবী সা. কে দেখে দ্রুত অতিক্রম করলেন। নবী সা. তাদের বললেন: শান্ত হও! এ হচ্ছে সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়ায়। তারা উভয় আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল: سُبْحَانَ الله হে আল্লাহ রাসূল! (নবী সা. ব্যাপারটিকে অনেক বড় হিসেবে মনে করায়, তারা আশ্চর্য হয়ে) নবী সা. বললেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّيْ خَسِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْءاً ، أَوْ قَالَ شَيْئاً .
البخاري : ٣١٠٧ ومسلم : ٢١٧٥.

'শয়তান মানুষের রগে রগে বিচরণ করে, আমি আশংকা করেছি, সে তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা যোগাবে, আলী বিন হাসান রা. বলেন– নবী সা. মসজিদে অবস্থান করে ছিলেন এবং তার সাথে তাঁর স্ত্রীগণও অত:পর তারা চলে গেলেন। নবী সা. সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই কে বললেন – তুমি তাড়াহুড়ো করো না আমিও তোমার সাথে বের হবো। সাফিয়্যার ঘর ছিল 'দারে উসামা' তে, নবী সা. তার সাথে বের হলেন; পথে দুই জন আনসারী ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে তাঁকে দেখে দ্রুত চলল। নবী তাদের কে ডেকে বললেন এ হচ্ছে সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই। তারা হতবিহবল হয়ে বলল: সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল। নবী সা. বললেন–

শয়তান মানুষের রগে রগে বিচরণ করে আমি ভয়েছিলাম সে তোমাদের অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা দেয় কিনা।[১]

হাদিস থেকে যা শিখলাম[২] :

১.নবী সা. এর উম্মতের প্রতি দয়া, তাদের কল্যাণের প্রতি সুদৃষ্টি, তাদের আত্মা এবং অঙ্গ–প্রতঙ্গ রক্ষার নির্দেশনা দান। কারণ নবী সা. ভয়ে ছিলেন যে, শয়তান এ দুইজনের অন্তরে নবী সা. এর ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি করবে। আর নবীদের ব্যাপারে কুধারণা কুফরী।

ইমাম শাফী রাহ. বলেন– নবী তাদের প্রতি কুফরীর ভয় করেছিলেন, যদি তাঁর প্রতি তারা অপবাদের চিন্তা করতো। তাই তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে দ্রুত বিষয়টি তাদের জানিয়ে দিলেন, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয় এমন কোন কুমন্ত্রণা শয়তান তাদের অন্তরে নিক্ষেপের পূর্বেই।

২.ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত বৈধ হওয়া, মহিলাদের জন্য স্বামীর সাথে রাত্রে অথবা দিনে সাক্ষাত করা, কথা বলা দোষণীয় নয় এবং এতে ইতিকাফকারীর ইতিকাফের কোন ক্ষতি হবে না। তবে অতিরিক্ত গমনাগমন ইবাদতে বিগ্ন সৃষ্টি করে কখনো বা ইতিকাফ বিনষ্ট করে দেয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্তের ফলে।

৩.মুসলিমের উচিত সন্দেহের স্থান থেকে দূরে থাকা, এবং যে বিষয়ে খারাপ ধারণার আশঙ্কা করবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে নিরসণ করা। বিশেষত আলেম সমাজকে– মানুষ যাদের অনুসরণ করে। তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা তাদের অনুসারীদের মাঝে সন্দেহের জন্ম দেয়। এতে করে তাদের জ্ঞানের উপকারিতা নষ্ট হয়। এমনি ভাবে হাকিম, তার বিচার ফায়সালার ব্যাখ্যা দিবে বিবাদির জন্য যদি বিবাদির কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়।

৪.শয়তান এবং তার ষড়যন্ত্র হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক। সে মানুষের রগে রগে বিচরণ করে থাকে।

---

[1] বুখারী,২০৩৮ মুসলিম , ২১৭৫

[2] সারহুননববী আলা মুসলিম.৫৬/১৪ সারহে ইবনে বাত্তাল, ১৭২-১৭৫/৪ ফাতহুল বারী, লি ইবনে হাজার, ২৮০/৪ আউনুল মাবুদ১০৩/৭

৫.কোন বস্তুকে বড় মনে করে এবং আর্শ্চান্বিত হয়ে সুবহানাল্লাহ বলা বৈধ ।
৬.ইতিকাফকারীর ইতিকাফকালিন সময় বৈধ কাজে জড়ানো যাবে । সাক্ষাত প্রদান, স্বগতম জানানো, অন্যের সাথে কথা বলা তবে অতিরিক্ত নয় ।
৭.ইতিকাফকারীর জন্য শিক্ষাদান, শিক্ষণীয় প্রোগামে অংশ গ্রহণ, দ্বীনি বিষয়াদি লেখা, তবে এসব বেশি পরিমানে করা নয়, কারণ ইতিকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া ।
৮.ইতিকাফকারী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন খাবার বিক্রি করতে পারবে ।
৯.মহিলারা রাত্রে বাহিরে যেতে পারবে যদি নিরাপত্তা থাকে ।
১০.সঙ্গম ভিন্ন ইতিকাফকারী স্ত্রীর সাথে একান্তে অবস্থান করতে পারবে ।
১১.পুরুষের সাথে স্ত্রী থাকলে ঐ পুরুষকে সালাম দেওয়া যাবে, কারণ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে[৩] ঐ দুই ব্যক্তি রাসল সা. কে সালাম দিয়ে ছিল । রাসূল সা. এতে আপত্তি জানাননি ।
১২.স্বস্ত্রীক চলাকালিন অপরিচিত পুরুষ অথবা মাহরামকে সম্বোধন করা যাবে, বিশেষত কোন বিধান বর্ণনা অথবা বিপদ নিরসন লক্ষে । এটা পুরুষত্ব বিরোধী নয় ।
১৩.ইতিকাফকারী কথা এবং কাজের মাধ্যমে তার উপর থেকে সন্দেহ নিরসন করা বৈধ যেমন নবী সা. করেছেন । তেমনি তার জন্য বৈধ তার উপর কারো পক্ষ হতে পতিত কষ্টদায়ক বস্তু কাজের মাধ্যমে দূর করা । জানা কথা, নামাযরত ব্যাক্তির সামনে চলাচলকারী ব্যক্তিকে নামাযে থেকেই বাধাদান বৈধ । ইতিকাফকারীর জন্য তাকে কেউ কষ্ট দিতে চাইলে অনুরূপ তাকে বাধা প্রদান বৈধ ।
১৪.ধীরস্থীরে কাজ করা সবকাজে তাড়াহুড়ো পরিহার করা । যদি একান্ত প্রয়োজন দেখা না দেয় । নবী সা. এর বাণী عَلَى رِسْلِكُمَا তোমরা দুই জন সান্ত হও ' দ্বারা তা প্রতিয়মান হয় ।
১৫.নবী সা. এর স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করা । কেননা তাঁর স্ত্রীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নাহ ইতিকাফ কালিন তাঁর সাথে সাক্ষত করে, ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি সাফিয়্যাহ কে বললেন– তাড়হুড়ো করোনা । কারণ তার আগমন অন্যদের চেয়ে দেরীতে হয়ে ছিল । তাই তাকে আরো কিছুক্ষণ তাঁর সানিধ্যে থাকতে বলা হলো যাতে সমতা নিশ্চিত হয় । অথবা সাফিয়্যাহ রা. এর অন্য সঙ্গিনীদের ঘর ছিল নিকটে আর সাফিয়্যাহ এর ঘর ছিল দূরে তাই রাসূল সা. তার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল বলে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ।

[3] বুখারী, ১৯৩০ ইবনে মাজা, ১৭৭৯ ।

Rvbœv‡Z †ivhvi GKwU `iRv Av‡Q

mvnvj web mv` †_‡K ewYZ, ivmj mv. e‡jb :

«في الجنَّةِ ثمَانِيَةُ أبْوَابٍ فيهَا بَابٌ يُسَمَّي الرَّيَّانُ لا يَدْخُلُهُ إلاّ الصَّائِمُونَ» رَوَاهُ الشَّيخَان

জান্নাতে আটটি দরজা আছে তার মধ্যে একটি দরজার নাম “রাইয়ান” যে দরজা দিয়ে রোজাদার ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।[১]

বুখারীর বর্ণনার ভাষা এমন:

«إنَّ في الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لهُ الرَّيَّانُ يَدخُلُ منهُ الصَّائِمونَ يَوْمَ القِيامَةِ لا يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، يقالُ: أيْنَ الصَّائِمونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدخُلُ منْهُ أحَدٌ غيرُهُم، فإذا دَخَلُوا أغْلِقَ فلَم يَدخُلْ مِنْهُ أحَدٌ»

জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে রাইয়ান বলা হয় কেয়ামত দিবসে সেখান দিয়ে রোজাদার প্রবেশ করবে, রোজাদার ছাড়া আর কেউ সেখান দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে: রোজাদার কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে, তারা ছাড়া আর কেউ সেখান দিয়ে প্রবেশ করবে না, যখন প্রবেশ করবে দরজা বন্দ করে দেয়া হবে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করবে না।[২]

তিরমিজির বর্ণনার ভাষা এমন:

إنَّ في الجنَّةِ لبَاباً يُدعَى الرَّيَّانُ، يُدعَى لهُ الصَّائِمُونَ، فمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لم يَظمَأْ أبَداً»

জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে রাইয়ান বলা হয়, সেখানে রোজাদারকে ডাকা হবে, যিনি রোজাদার হবেন তিনি প্রবেশ করবেন, আর যে সেখানে প্রবেশ করবে সে কখনও পিপাষার্ত হবে না।[৩]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন :

«مَنْ أنفَقَ زَوجَينِ في سَبِيلِ الله نُودِيَ مِنْ أبْوابِ الجَنَّةِ: يا عَبدَالله: هَذَا خَيْرٌ، فمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، ومَنْ كَانَ منْ أهْلِ الجِهادِ دُعِيَ من بَابِ الجِهادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ من بَابِ الرَّيَّان، ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصَّدَقةِ دُعِيَ من بَابِ الصَّدَقةِ، فقالَ أبو بَكرτ : بِأبي وأمِّي يا رَسُولَ الله، مَا عَلى مَن دُعِيَ من تلكَ الأبوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ من تِلكَ الأبوَابِ كلِّها؟ قالَ: نَعَم، وأرجُو أن تكُونَ مِنهُم» رواه الشيخان

আবু হুরায়রা রা. রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আলাহর রাস্তায় দুটি জিনিস খরচ করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ দিয়ে ডাকা হবে এই বলে: হে আব্দুলাহ ইহা তোমার জন্য কল্যাণকর। যে নামাযী হবে তাকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে এবং যে জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে আর যে রোজাদার হবে তাকে রাইয়ান দরজা দিয়ে ডাকা হবে আর যে দানশীল হবে তাকে দানের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর রা. বললেন, হে আলাহর রাসূল আমার মাথা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক তার কি হবে যাকে অবশ্যই এই সমস্ত দরজাসমূহ থেকে এক যোগে ডাকা হবে? কাহাকেও কি এই সমস্ত দরজা থেকে এক যুগে ডাকা হবে? আলাহর রাসূল বললেন: হ্যাঁ আর আমার প্রত্যাশা তুমি তাদের মধ্য থেকে হবে।[৪]

বুখারী ও মুসলিমের শব্দ এমন এসেছে:

«دُعَاه خَزَنَةُ الجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أيْ: فُلْ، هَلُمَّ»

জান্নাতের প্রহরীরা এইভাবে ডাকবে প্রত্যেক দরজার প্রহরী বলবে: আস।

ইমাম আহমাদ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন:

«لِكلِّ أهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أبْوَابِ الجَنَّةِ يُدْعَونَ بذَلكَ العَمَل، ولأهْلِ الصِّيَام بَابٌ يُدْعَوْنَ مِنهُ، يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّان، فقالَ أبو بَكر: يا رَسُولَ الله، هَلْ أحَدٌ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأبْوابِ كُلِّها؟ قالَ: نَعَم، وأرجُو أنْ تَكُونَ مِنهُم يا أبا بَكْر»

প্রত্যেক আমলকারীর জন্য জান্নাতের একটি একটি দরজা থাকবে যে দরজা থেকে তার আমল অনুযায়ী ডাকা হবে, রোজাদারের জন্য দরজা থাকবে সেখান থেকে তাকে ডাকা হবে যে দরজার নাম হল রাইয়ান। আবু বকর রা. বললেন, হে আলাহর রাসূল কাউকে কি সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ আর আমার আসা তুমি তাদের মধ্য থেকে হবে হে আব বকর?

---

1 বুখারী ৩০৮৪ মুসলিম ১১৫৫

2 বুখারী ১৭৯৮।

3 তিরমিজি ৭৬৫।

4 বুখারী ১৭৯৮ মুসলিম ১০২৭ ।

আবু বকর রা. যখন প্রশ্ন করলেন নবী সা. কে তার উদ্দেশ্য ছিল যাকে জান্নাতের কোন একটি দরজা দিয়ে ডাকা হবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে সব দরজা দিয়ে না ডাকলেও তার কোন অসুবিদধা হবে না। কেননা, জান্নাকে প্রবেশের উদ্দেশ্যত তার হাসিল হয়ে যাবে এতত সত্যেও কি কাওকে সমস্ত দরজা দিয়ে ডাকা হবে? নবী সা. তার উত্তরে হ্যাঁ বললেন।

হাদিসগুলো থেকে যা শিখলাম :

প্রথমতঃ রোজার মর্যাদার কারণেই জান্নাতের আটটি দরজা থেকে একটি রোজাদারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দিত্বীয়তঃ রাইয়ান জান্নাতের একটি দরজার নাম যা الرَّيِّ
শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ পান করান রোজাদার নিজেকে পান করা থেকে বিরত রেখেছিল যার প্রয়োজন মানুষের সব চেয়ে বেশি, সে কাজের প্রতিদানও পরকালে পান করানোর মাধ্যমে হওয়াই যতার্থ যে পানের মাধ্যমে কখনও পিপাশিত হবে না।
তৃতীয়তঃ হাদীসে যে সমস্ত ইবাদতের জান্নাতে দরজার কথা উলেখ হয়েছে নামায, জিহাদ, রোজা, দান প্রত্যেকটি দরজা নির্দিষ্ট থাকবে এই সমস্ত ইবাদতকারীদের জন্য। এখানে উদ্দেশ্য হল অধিক হারে যে যে ইবাদতটি করবে তার জন্য সেই দরজাটি নির্দিষ্ট হবে।
চতুর্থতঃ জান্নাতের দরজাগুলির জন্য প্রহরি ফেরেশতা আছে প্রত্যেক আমলকারীকে নির্দিষ্ট ফেরেশতা নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে ডাকবে, ইহা এই প্রমাণ বহন করে যে, ফেরেশতারা আদম সন্তানের নেক আমলকে পছন্দ করে এবং তাতে খুশি হয়।
পঞ্চমতঃ আবু বকর রা. মর্যাদা তাকে সমস্ত দরজা দিয়ে ডাকা হবে কেননা তিনি সমস্ত আমলগুলি করেন আর রাসূলের আশা প্রকাশ «وَأَرجُو أَنْ تَكُونَ مِنهُم» এটা অবশ্যই ঘটবে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসে এসেছে যা দ্বারা বুঝা যায় যে , আবু বকর রা. কে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা ও রুম থেকে ডাকা হবে।[৫]
ষষ্টতঃ হাদীসে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে ঐ সমস্ত দরজা দিয়ে অল্প সংখাক লোকদেরকে ডাকা হবে।[৬]
সপ্তমতঃ হাদীসে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে সমস্ত আমলের কারণে ডাকা হবে তা নফল আমল, ফরজ আমল নয়। কেননা ফরজ আমলকারীর সংখা তো অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু ফরজ আদায়ের পর নফলও গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে এমন লোকের সংখা কম হবে।
অষ্টমতঃ মানুষের সামনে তার প্রসংশা বৈধ যদি সে এর দ্বারা ধোকায় না পড়ে।[৭]
নবমতঃ যে ব্যক্তি এই সমস্ত ভাল কাজগুলি সব সময় করবে জান্নাতের দরজাগুলি তাকে আহবান করা এতা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কিন্তু সে জান্নাতের একটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে।
দশমতঃ ভাল কাজ একজন মানুষের জন্য সবগুলি করা সাধারণত কঠিন। যদি কেউ কিছু করতে পারে তবে কিছু বাদও পড়ে যায়। খুব অল্প সংখক লোক সমস্ত কাজ করতে পারে আবু বকর রা. সেই অল্পদের মধ্য থেকে।
একাদশতমতঃ যে ব্যক্তি যে কাজে বেশি প্রশিদ্ধি লাভ করেছে তাকে সেই কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেমন রাসূল সা. এর কথা «فَمَن كَانَ مِنْ أَهلِ الصَّلاةِ» অর্থাৎ যে অধিক পরিমানে নামায পড়বে তাকে নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে। তা ছাড়াতো সমস্ত মুসলমানই কম বেশি নামাযী।

---

[5] সহিহ ইবনে হাব্বান ৬৭৬৭।
[6] ফতহুল বারী ২৮/৭।
[7] পূর্ব সূত্র ২৯-২৮/৭

সাহরির উত্তম সময় কোনটি

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– 'বেলালের আজান যেন তোমাদের কাউকে সাহরি খাওয়া থেকে বাধা না দেয়। কারণ তিনি আজান দেন কিংবা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ডাকেন এবং ঘুমন্তদের জাগাতে। ফজর এই নয় যে, 'এমন বলল' (ইয়াহয়া ইবনে সায়িদ আল কাত্তান এ কথা বলে নিজ হাতের তালুদ্বয় একত্রিত করলেন) 'আর এমন বলল' (ইয়াহয়া এ কথা বলে তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করলেন।)[১]

সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সস্ত্রীক সাহরি করতাম তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পেছনে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য তাড়াতাড়ি ছুটতাম।'[২] বুখারির রেওয়ায়েত মতে, 'অতপর আমার তাড়াহুড়া হত যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সিজদা পাই।'[৩]

জর বিন হুবাইশ র. বলেন, আমি হুযায়ফার সঙ্গে সাহরি করলাম তারপর আমরা ছুটলাম মসজিদ অভিমুখে, মসজিদে পৌঁছে দু'রাকাত সালাত আদায় করলাম। আমরা পৌঁছার মুহূর্তকাল পরেই জামাত দাঁড়িয়ে যায়।'[৪]

উল্লেখ্য যে, হাদিসে বর্ণিত 'সালাতরতদের ফেরাতে' বাক্যাংশের অর্থ হল, বেলাল রা. এ আজানের মাধ্যমে তোমাদের জানান যে, ফজর আর বেশি দূরে নয় অতএব যেন তাহাজ্জুদরত ব্যক্তি হালকা বিশ্রামে যান যাতে সতেজ দেহে ফজরের সালাতে অংশ নিতে পারেন অথবা যিনি বিতর পড়েন নি বিতর পড়ে নিতে পারেন কিংবা ফজরের সালাতের জন্য ফজরের পূর্বক্ষণে পবিত্রতা হাসিল বা এধরনের কোনো প্রয়োজন থাকলে তা মিটিয়ে নিতে পারেন।

আর 'ঘুমন্তদের জাগাতে' বাক্যাংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে- ঘুমন্তরা যেন ঘুম থেকে জেগে ফজরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে। যেমন- তাহাজ্জুদ পড়তে ইচ্ছুক সংক্ষিপ্ত তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারে, যে বিতর পড়ে নি সে বিতর পড়ে নিতে পারে, যে রোজা রাখবে সে সাহরি খেয়ে নিতে পারে এবং যার অজু-গোসল বা ফজরের পূর্ব মুহূর্তে যেসব প্রয়োজন সারতে হয় তা সম্পন্ন করতে পারে।[৫]

হাদিস থেকে যা শিখলাম :

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম ফজরের একেবারে পূর্বলগ্নে সাহরি করতেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যে তারা এতোটা বিলম্বে সাহরি খেতেন যে খাওয়া সংক্ষিপ্ত করে জামাত ধরার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটতেন। সুতরাং জানা গেল ফজরের একেবারে পূর্বলগ্নে সাহরি খাওয়া সুন্নত।

২. প্রয়োজনকালে আহার গ্রহণের সময় তাড়াহুড়া করা জায়িজ। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারি র. 'সাহরি তাড়াতাড়ি করা তথা দ্রুত খাওয়া' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই কায়েম করেছেন।[৬] ইমাম মালেক র. আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর রা. হতে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রমজান মাসে রাতের সালাতে (ফজর) যেতাম আর আমাদের খাদেমদের ফজরের জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় তাড়া দিলাম।[৭]

---

[১]. বুখারি : ৬৮২০, মুসলিম : ১০৯৩
[২]. বুখারি : ৫৫৪
[৩]. বুখারি : ১৮২০, আবু ইয়া'লা : ৭৫৩৩
[৪]. নাসায়ি : ৪/১২৪
[৫]. প্রাগুক্ত : ৭/২০৪, আল মুফহিম : ৩/১৫৩
[৬]. সহি বুখারি : ২/৬৭৮, ফাতহুল বারি : ৪/১৩৭
[৭]. মুয়াত্তা মালেক : ১/১১৬, বাইহাকি : ২/৪৯৭

কতক্ষণ পর্যন্ত সাহরি গ্রহণ করা যায়?

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. ইরশাদ করেন- রাত্রিকালে বেলাল আজান দেয়, তোমরা (তার আজান শুনে) পানাহার জারি রাখতে পার যাবৎ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেয়। অতপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ। যতক্ষণ কেউ তাকে 'সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে' না বলে তিনি আজান দেন না। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'জন মুয়াজ্জিন ছিল– বেলাল এবং অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বেলাল রাত্র বাকি থাকতেই আজান দেয় সুতরাং তার আজানের পরও তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পার যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেয়। রাবি বলেন, এ দু'জনের আজানের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান হতো যে একজন (মিনার থেকে) নামতেন তো অপরজন মিনারে উঠতেন।[১]

সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদেরকে যেন বেলালের আজান বা আকাশ দিগন্তের এমন লম্ব রেখা সাহরি গ্রহণ থেকে বিরত না রাখে যতক্ষণ না তা এভাবে ছড়িয়ে যায়। রাবি বলেন, অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে (সে রেখা ছড়িয়ে না যায়।) নাসায়ীর এক রেওয়ায়েতে আছে,'তোমাদের যেন বেলালের আজান বা (দিগন্তের) এই শুভ্রতা যেন ধোকায় পতিত না করে যাবৎ না রেখা এভাবে এভাবে বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়ে অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে। আবু দাউদ তয়ালিসি বলেন, একথা বলে তিনি হাত প্রসারিত করে ডানে বামে দেখালেন।[২]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদের কেউ যদি হাতে আহার-পাত্র হাতে নেয়া মাত্র আজান শুনতে পায় সে যেন প্রয়োজন সেরে তবেই সে পাত্র হাত থেকে রাখে।[৩] আহমদের বর্ণনায় অতিরিক্ত আরো বলা হয়েছে, 'এবং মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছিল যখন সুবহে সাদিকের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।'[৪]

হাদিস থেকে যা শিখলাম[৫] :

১. সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাসসহ সব ধরনের রোজা পরিপন্থি কাজ বৈধ।

২. অন্ধ লোক যদি সালাতের ওয়াক্ত জানতে পারে অথবা কেউ তাকে জানিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য আজান দেয়া জায়িজ আছে।

৩. ফজরের আজান দু'বার দেয়া বৈধ। একবার ফজরের পূর্বলগ্নে দ্বিতীয়বার ফজর উদয় হওয়া মাত্র।

৪. সাহরি গ্রহণের আগেই রোজার নিয়ত করা জায়িজ এবং নিয়ত করার পর খেলে রোজার নিয়ত ভঙ্গ হয় না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দিয়েছেন সুতরাং বুঝা গেল, নিয়ত আগেই করা হয়েছে এবং এর পর খাওয়া-দাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং রোজা পালনেচ্ছু যদি দুপুর রাতে রোজার নিয়ত করে আর সাহরি খায় একদম শেষ মুহূর্তে তাহলে তার নিয়ত ভঙ্গ হবে না।

৫. ফজর উদয়ে সংশয় বোধ করলে সাহরি খাওয়া জায়িজ আছে। কারণ নিচের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাত অবশিষ্ট থাকাটাই স্বাভাবিক। "তোমরা পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা থেকে কালো রেখা সুস্পষ্ট আলাদা না হয়ে যায়।" আর যে সন্দেহে দোদুল্যমান তার কাছে

---

[১]. বুখারি : ৫৯২, মুসলিম : ১০৯২

[২]. মুসলিম : ১০৯৪, আবু দাউদ : ২৩৪৬, তিরমিযি : ৭০৬, নাসায়ী : ৪/১৪৮

[৩]. আবু দাউদ : ২৩৫০, আহমদ : ২/৫১০, দারে কুতনি : ২/১৬৫, বাইহাকি : ৪/২১৮

[৪]. মুসনাদে আহমদ : ২/৫১০ তাবরানি : ২/১৭৫, বাইহাকি : ৪/২১৮

[৫]. আল মুফহিম : ৩/১৫০, শরহে নাববি : ৭/২০৪, ফাতহুর বারি : ২১/৯৯-১০০, আদ দিবাজ : ৩/১৯৩

তো ব্যাপারটি অস্পষ্ট। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে– তুমি খেতে থাক যতক্ষণ সংশয়বোধ কর যাবৎ না তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।[৬] এটি প্রযোজ্য কেবল সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ফজরের প্রতীয়ক্ষায় আছে এবং ফজর উদয়ের ব্যাপারে সংশয়ে ভুগছে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি আজান বা ঘড়ির ওপর নির্ভর করে তাহলে তার জন্য কোনো সন্দেহ ধর্তব্যের মধ্যে নয় কারণ সে অন্যকে জিজ্ঞেস করে বা ঘড়িতে সময় দেখে নিশ্চিত হতে পারে।

৬. সাহরি করা মুস্তাহাব এবং বিলম্বে সাহরি গ্রহণ করাও মুস্তাহাব।

৭. উল্লেখিত বাক্যাংশ-'দু'জনের আজানের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান হতো যে একজন (মিনার থেকে) নামতেন তো অপরজন মিনারে উঠতেন।' –এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববি র. বলেন, বেলাল রা. ফজরের আগেই আজান দিতেন তারপর মিনারায় বসে বসে দুআ-দরুদ পড়তে থাকতেন আর অপেক্ষা করতেন উদয়ের। অবশেষে যখন ফজর উদয়ের সময় ঘনিয়ে আসত সেখান থেকে নেমে আসতেন এবং ইবনে উম্মে মাকতুম রা.কে জাগাতেন। ইবনে উম্মে মাকতুম রা. অজু-ইস্তেঞ্জা সারতেন তারপর ফজরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্র মিনারে উঠে আজান দিতেন।[৭]

৮. বুঝা গেল, ফজরের পরের সময়কে সকাল বলা হবে রাত নয়।[৮]

৯. মানুষকে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে ডাকাও বৈধ যদি সে ওই নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৯]

১০. 'ফাজরে আউয়াল' এবং 'ফাজরে ছানি'-র মাঝে তিনটি পার্থক্য রয়েছে। যথা– প্রথম পার্থক্য. 'ফাজরে আউয়াল' হলো, দিগন্তে আড়াআড়ি রেখা অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রলম্বিত রেখা। আর 'ফাজরে ছানি' হলো, দিগন্তে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত অর্থাৎ পুর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত আলোকরেখা।

দ্বিতীয় পার্থক্য, 'ফাজরে ছানি' র পরে আর অন্ধকার থাকে না বরং সূর্যোদয় পর্যন্ত আলো ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে পক্ষান্তরে 'ফাজরে আউয়াল' তার ইষৎ আলো ছড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে যায়।

তৃতীয় পার্থক্য. 'ফাজরে ছানি' র শুভ্রতা দিগন্তের সঙ্গে লাগোয়া দেখা যায় আর 'ফাজরে আউয়াল' এর শুভ্রতা এবং দিগন্তের মাঝখানে হালকা অন্ধকার থাকে।[১০]

১১. মুয়াজ্জিন যদি এমন মুহূর্তে ফজরের আজান দেয় রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যখন সাহরি গ্রহণের জন্য পাত্র হাতে নিয়েছে তাহলে তার জন্য খাবার শেষ করার অনুমতি রয়েছে। এটা হলো শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড়। সুতরাং শুকরিয়া দয়াময় সে রবের জন্য।[১১]

---

[৬]. মজমু : ৬/৩১৩, যখিরাতুল আকবী : ২০/৩৫৫

[৭]. আর মুফহিম : ৩/১৫১, শরহু নাবাবি : ৭/২০৪ আদ দিবাজ : ৩/১৯৪

[৮]. আল মুফহিম : ৩/১৫১, ফতহুল বারি : ২/১০১

[৯]. ফতহুল বারি : ২/১০১

[১০]. ফিকহুল ইবাদাত : ১৭২-১৭৩

[১১]. আল মিন্নাহ লিল আলবানি : ৪১৭-৪১৮

gZ¨ e¨w³ i c¶ †_‡K †ivRv ivLv

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন:

«مَنْ مَاتَ وعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وليُّهُ» متفق عليه

যে ব্যক্তি রোজা না রেখে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা রাখবে।[১]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يا رَسولَ الله، إن أُمِّي ماتَتْ وعَليها صَومُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقالَ عَليهِ الصَّلاة والسَّلام: **لَوْ كانَ على أُمِّكَ دينٌ أَكُنْتَ قاضِيْهِ عَنها؟** قالَ: نعم، قال: **فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضَى»** رواه الشيخان.

এক ব্যক্তি নবী সা. নিকট আসলেন সে বলল হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন এক মাসের রোজা না রেখে, আমি কি তার পক্ষ থেকে কাজা করব? রাসূল সা. বললেন: তোমার মায়ের উপর যদি ঋন থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করে দিতে? সে বলল হ্যাঁ। রাসূল সা. বললেন: আল্লাহর ঋন আদায় করার বেশি অধিকার রয়েছে।[২]

বুখারী এবং মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে:

«أنَّ امرأةً جاءَتْ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالتْ: يا رَسُولَ الله، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ: **أرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فقضَيتِهِ أكَانَ يُؤْدِي ذلكَ عنها؟** قالت: نعَم، قالَ: **فصُومِي عَنْ أمِّكِ»**

এক মহিলা নবী সা. এর নিকট এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন মান্নতের রোজা আদায় না করে আমি কি তার পক্ষ থেকে রোজা রাখব? রাসূল সা. বললেন: তোমার অভিমত কি তোমার মায়ের উপর যদি কোন ঋন থাকত তুমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ রাসূল সা. বললেন তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোজা রাখ।[৩]

বুরাইদা রা. বলেন,

«بينَا أنَا جَالسٌ عندَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ أتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أمِّي بجَاريةٍ وإنها ماتتْ. قالَ: فقالَ: **وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ المِيراث،** قالتْ: يا رسولَ الله، إنَّه كانَ عليها صومُ شَهرٍ أفأَصُومُ عنها؟ قال: **صُومِي عنها،** قالتْ: إنَّها لمْ تَحُجَّ قطُّ، أفأَحُجُّ عنهَا؟ قال: **حُجِّي عنها»** رواه مسلم

আমি যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বসা ছিলাম এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের জন্য একজন দাশি সদকা করেছি এবং তিনি মারা গেছেন

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সা. বললেন: তুমি প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং তুমি তাকে পাবে উত্তরাধিকার হিসেবে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তার জিম্মায় একমাসের রোজা ছিল, আমি কি তার পক্ষ থেকে রোজা রাখব? রাসূল সা. বললেন: তার পক্ষ থেকে রোজা রাখ। সে বলল, তিনি কখনও হজ করেন নি আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করব? রাসূল বললেন: তার পক্ষ থেকে হজ কর।[৪]

---

1 বুখারী ১৮৫১ মুসলিম ১১৪৭ ।

2 বুখারী ১৮৫৩ মসলিম ১১৪৫

3 মুগনী ২৯৯/৪ ।

4 মুসলিম ১১৪৯ আবু দাউদ ২৮৭৭ তিরমিজী ৬৬৭ নাসায়ী ৬৩১৪ ইবন মাজাহ ২৩৯৪ ।

হাদিসগুলো থেকে যা শিখলাম :

১- নিয়ম হল শুধু শারিরিক ইবাদাতে কোন প্রতিনিদিত্ব নেই কিন্তু ঐ হাদীস থেকে রোজাকে আলাদা করা হয়েছে, যেমন হজ আলাদা করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ: বলেন, এ কথার উপর শরীয়াতবিদদের এক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে নামাযে কেউ কারো প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না ফরজ, সুন্নাত, নফল কোনটাতেই না। জীবিত বা মৃত্যু কারো পক্ষ থেকে না। অনুরুপভাবে জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না এসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি রোজা না রেখে মারা গেছে তার রোজার প্রতিনিধিত্ব করা না করার ব্যাপারে পূর্বেকার এবং এখনকার শরীয়াতবিদদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান।[১]

২- যখন কেহ রোজা না রেখে মারা যায় তখন তার অবস্থা দুটোর একটা হবে: রোজা রাখার সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা গেছে। সময় না পাওয়ার কারণে বা অসুস্থতার কারণে অথবা সফরের কারণে বা অপারগ হওয়ার কারণে। এ ব্যক্তির ব্যাপারে অধিকাংশ শরীয়াতবিদদের মতামত হল সে দায়মুক্ত । দ্বিতীয় অবস্থা হল, কাজা রোজা রাখার সুযোগ পাওয়ার পর না রেখে মারা গেছে তখন সুন্নাত হল তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে।

৩- মৃত্যু ব্যক্তির আত্বীয়-স্বজন বা অন্য কারো জন্য দায়মুক্তির উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা শরীয়ত সিদ্ধ। রাসূল সা. কথায় অলী দ্বারা উদ্দেশ্য হল উত্তরাধিকারী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই দেখা যায়। যদি উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কোন নিকট আত্বীয় বা দূরবর্তি আত্বীয় তার পক্ষ থেকে রোজা রেখে দেয় তাও বৈধ ঋন পরিশোধ করার মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন নবী সা. মৃত্যু ব্যক্তির উপর যে ঋন থাকে তার সাথে তুলনা করেছেন, আর ঋন আদায় করে দেয়া তো যে কোন ব্যক্তির জন্য সঠিক, এটাই প্রমাণ করে যে, রোজা প্রত্যেকেই আদায় করে দিতে পারবে, সন্তানের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।[২]

৪- মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে মানত পুরা করা জরুরী নয় যেমন তার অলীগণের উপর ওয়াজিব নয় তার ঋন পরিশোধ করা কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে স্বপ্রনদিত হয়ে আদায় করলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।[৩]

৫- যদি তার জিম্মায় অনেকগুলি রোজা থাকে আর অনেক লোক মিলে একদিন রেখে দেয় তাহলেও শুদ্ধ হবে কিন্তু যে রোজার ভিতর পর্যায়ক্রম শর্ত তাতে শুদ্ধ হবে না যেমন জিহারের কাফ্ফারা ও হত্যার কাফ্ফারা সে অবস্থায় একজন পর্যায়ক্রমে রেখে দেবে।[৪]

৬- যদি কেউ তার পক্ষ থেকে রোজা না রাখে তাহলে তার অভিভাবকদের উচিত তার প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিন খাওয়াবে যদিও তা তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হয়।

৭- উত্তরাধিকারীগণ যদি কাউকে মুজরী দিয়ে একাজ করায় তবে তা বৈধ হবে না কেননা আত্বীয়তার বিষয়ে টাকা দিয়ে কাজ করানো ঠিক নয়।[৫]

৮- যদি মানত করে যে সম্মানিত মাসে রোজা রাখবে অতঃপর সে মারা গেল জিলহজ মাসে তবে তা আদায় করতে হবে না কেননা, ওয়াজিব হওয়ার সময় সে পায়নি যেমন রমজান আসার পূর্বেই সে মারা গেল।[৬]

---

[1] আল-ইসতেজকার ৩৪০/৪

[2] মাজমুয়ুল ফাতাওয়া ৩১১/২৪।

[3] মুগনী ৩৯৯/৪

[4] বুখারী ৬৯০/২ মাজমুয়ু ফতাওয়া বিন বায ৩৭৫/১৫

[5] আশ শরহুল মুমতে ৪৫৬/৬।

[6] আশ শরহুল মুমতে ৪৫৬/৬।

৯- যার উপর রমজানের কিছু দিনের রোজা ফরজ হয়েছিল এবং সে ইচ্ছা পোষণ করেছে যে তার আত্বীয়র পক্ষ থেকে কাজা অথবা কাফ্ফারা অথবা মানতের রোজা রাখবে তবে তার কর্তব্য হল প্রথমে নিজের রোজা রাখবে অতঃপর আত্বীয়র পক্ষ থেকে রাখবে ।[১]

১০- শুদ্ধ মত হল কাজা রোজার মধ্যে পর্যায়ক্রম শর্ত নয় কিন্তু উত্তম হল পর্যায়ক্রমে রাখা কেননা এটি আদায়ের অনুরুপ ।

১১- ঈদের দিন পর্যায়ক্রমকে ভঙ্গবে না ঐ রোজার মধ্যে যেখানে দুঃমাস পর্যায়ক্রম শর্ত ।[২]

---

[1] ফতাওয়া লাজনাদ্দায়েমা ৭৯৪৬ ।

[2] পূর্বতন ১০২ ।